Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501059 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

'Sundaram': Subodh Ghosh's search for beauty and unmasking the fake 'civilized'

'সুন্দরম্': সুবোধ ঘোষের সৌন্দর্য সন্ধান ও মেকি 'সভ্য'এর মুখোশ উন্মোচন

Sk Samirul Islam
Researcher
Bengali Department
Calcutta University

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
Against the backdrop of the World Wars and the subsequent era, Subodh Ghosh pioneered a distinct stream of profound realism within the Bengali short story tradition. His works accord particular significance to the lives of the middle class, the lower class, and the marginalized members of society. Subodh Ghosh places at the very center of his narratives those individuals who exist on the periphery of so-called civilized society; it is through the context of their lives that he unveils the true face of a hypocritical civilization. His short story, 'Sundaram,' stands as a brilliant exemplar of this perspective. In this work, the author simultaneously explores the true essence of 'beauty' while exposing the inner unscrupulous tendencies and hypocrisy of a middle-class youth. Concurrently, through the plight of a helpless beggar girl, he highlights the ruthless realities of society. In the story's denouement, the author unmasks so-called civilized society, delivering a scathing indictment that compels the reader to engage in deep reflection.

Key Words:
Subodh Ghosh, Chotogalpo, Sundaram, Prantik Samajer manush, Madhyabitto Sampraday er bastab rup

মূল প্রবন্ধ

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে আবির্ভূত হন সুবোধ ঘোষ। তাঁর জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। ছোটোগল্পকার সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "আসলে সে সময়ের ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজ ভাবনায় শ্রেণী-সমন্বয় অসম্ভব ছিল, ছিল শ্রেণী-সংঘর্ষের, তার মানবতা বিধ্বংসী রূপের সত্য-স্বীকৃতি। সময়কে, সমাজকে পাশে সরিয়ে রেখে, তাদের দাবিকে এড়িয়ে সুবোধ ঘোষ নরনারীর হৃদয়ধর্মের কথায় মুখর হন। সেসব গল্পের শরীরে জৌলুস, জাঁকজমক, তীব্র আকর্ষণ, ভিতরে নিষ্ফল ভাব বিনিময়ের অভিজ্ঞতা। গল্পকার সুবোধ ঘোষ এভাবেই নিজের সীমা চিহ্নিত করেন নিজের লেখনীতেই।"[১] বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অর্থনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি চেতনায় প্রখর বাস্তবজ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তবতার এক নতুন রূপ নিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের জগতে হাজির হন সুবোধ ঘোষ। তিনি তাঁর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সর্বহারা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের স্থান দিয়ে তাদের এক অনন্য বাস্তব রূপকে আমাদের চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, "সুবোধ ঘোষ গোড়া থেকেই আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচক। এক্ষেত্রে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য সহযাত্রী।"[২] সুবোধ ঘোষ প্রান্তিক মানুষদের, সভ্য সমাজ থেকে দূরবর্তী থাকা মানুষদের সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু করে তারই প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত ও তথাকথিত সভ্য সমাজের ভণ্ডামি, নীচতা,

© Santiniketan Sahityapath

ভেতরে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে বাইরে ভালোসাজার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয়গুলি দেখিয়েছেন। এরকমই একটি গল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্প সংকলনের অন্যতম গল্প 'সুন্দরম্'। এই গল্পে লেখক আসলে 'সুন্দর কী? সুন্দরের সংজ্ঞা কী?' তার খোঁজ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবকের মেকি খোলসের আড়ালে অনৈতিক কিছু দিক, এবং এক প্রান্তিক অসহায় ভিখারি মেয়ের অসহায়ত্বের দিক। গল্পের শেষে লেখক সমাজের মেকি খোলসধারী সভ্য সেজে থাকা মানুষের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের নির্মম কষাঘাত করেছেন। গল্প শুরু হয়েছে কৈলাস ডাক্তারের ছেলে সুকুমারের বিয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে। সুকুমার ১২ বছর বয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছে, নিরামিষভোজী। ফোঁটা তিলক করে আসছে চিরকাল। মুসুরি ডাল পর্যন্ত খায় না। সাহিত্যের পুস্তক তার কাছে অস্পৃশ্য। এই বৈরাগ্য থেকে ছেলেকে দূরে সরাতে ছেলের বিয়ে দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করল পরিবার। ভগ্নিপতি কানাইবাবু দায়িত্ব নিলেন সুকুমারকে ব্রহ্মচর্য থেকে সাধারণ সংসার জীবনে মন ফেরানোর। তারই প্রচেষ্টায় সুকুমার একসময় সিনেমা দেখা শুরু করে, কাব্য পড়াতে আগ্রহ জাগে। তারপর ধীরে ধীরে সুকুমারের মনে হয় 'কিসের যেন অভাব! কাকে যেন চাই।' পরিবর্তিত মনের সুকুমার এক সময় কানাই বাবুকে বলেছে 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

সুকুমারের এবার বিয়ের দিকে মন ফিরেছে। কিন্তু বড়ো বাধা হলো পাত্রী নির্বাচন। পাত্রী চাই একেবারে নিখুঁত সুন্দর সঙ্গে গুণবতী। তার পিতা অবশ্য বাহ্যিক সৌন্দর্যে বিশ্বাসী নয়। প্রথমত দেখা হলো উকিলের মুহুরী যাদব বোসের মেয়ে বনলতাকে, তারপর নন্দ দত্তের মেয়ে দেবপ্রিয়া, অনাদি সরকারের মেয়ে সুশিক্ষিতা অনুপমা, সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে। কিন্তু এদের কাউকেই পছন্দ হয়নি সুকুমারের বা তার পিসিমার, তার ছোটো বোন রানুরও। তাদের মতে এদের কেউ 'হাঘরে মেয়ে', কেউ বংশে খাটো বা কেউ কিপটে, বা কেউ 'ঝিরকুট' চেহারার যা সুকুমারের সঙ্গে একদম মানাবে না, যেন 'হদ্ কুৎসিত'। আসলে পরিবারের দরকার সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে গুণে, বংশে সব কিছুতে উন্নত মেয়ে। এদিকে সুকুমারের বাবা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে, যে সুন্দর চাওয়া হচ্ছে সেই সুন্দর কাকে বলে? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে সুন্দর বলা যায়? কৈলাস ডাক্তারের মতে বাহ্যিক সুন্দর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সুন্দর সম্পর্কে কানাইবাবুকে বলা তাঁর উক্তি — "চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে। শাশ্বত কালি দিয়ে?"[৩] অ্যানথ্রপলজিস্ট-এর কথা উল্লেখ করে কানাইবাবু যখন বলেছেন মানুষের রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড অবশ্যই আছে, তখন চড়া মেজাজে কৈলাস ডাক্তার বলেছেন — "আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ। মেলা বকো না আমার কাছে।"[৪]

সুকুমারের পাত্রী দেখাশোনার মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে এক ভিখারি মেয়ে তুলসী এবং তার পরিবার। কুষ্ঠ রোগী হাবু ও বসন্তে কানা হামিদার মেয়ে সে। কুৎসিত দর্শন এবং অপরিষ্কার তাকে যেন অসুন্দরের প্রতিমূর্তি হিসেবেই দেখানো হয়েছে। তার পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড় বুকের উপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। লেখকের বর্ণনায় — "দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দস্তুর মতো একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে।"[৫] তুলসী এবং তার পরিবারকে সভ্য ভদ্র সমাজ দূরে রাখতে চায়, তার অসহায়। তার পিতা হাবু বোষ্টম, তাঁতির ছেলে কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে। মাতা হামিদা, সে বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। এখন তুলসীর ভিক্ষের রোজগারেই তাদের পেটভাতের প্রধান নির্ভরতা। তারা এখন আশ্রয়হীন। আশ্রয়ের সামান্য সাহায্যের জন্য কৈলাস ডাক্তারের কাছে এসেছে। মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশে বস্তি ভেঙে দেওয়ার ফলে তাদের শহরে থাকার হুকুম না থাকায় তারা যাতে মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে একটু জায়গা পায় তার জন্য ডাক্তার কৈলাসের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। এই সার্টিফিকেটের জন্যই কৈলাস ডাক্তারের কাছে তাদের আগমন। কিন্তু এরপর থেকে প্রায়ই ডাক্তারবাবুর বাড়ির আশেপাশে দেখা যায় তুলসীকে। তুলসী প্রায়ই ডাক্তারবাবুর বাড়ির বাগানে আসত। তাদের বাড়ির দুই কাজের সহকারী যদু ও নিতাই মাঝে মাঝে সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে থাকা তুলসীকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। কৈলাস ডাক্তারের সন্দেহ হয় তুলসী চুরির মতলবে আসছে। সুকুমারের

© Santiniketan Sahityapath

ঘরে ঢিল ছড়ার ঘটনাও সামনে আসে। একদিন কৈলাস ডাক্তার নিজে দেখেন একদিন ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মতো পা টিপে টিপে পালাচ্ছে তুলসী। কৈলাস ডাক্তার ঘরে এসে দেখেন সুকুমারের ঘরে আলো জ্বলছে, বারান্দায় আলো। কৈলাস ডাক্তার ভাবেন নিশ্চয়ই কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে, কিন্তু না কিছুই হারায় নি।

এদিকে সুকুমারের জন্য একের পর এক পাত্রী দেখে পরিবারের কারো পছন্দ না হওয়ায় নিজে হাল ছেড়ে দেন কৈলাসবাবু। পাত্রী এখন দেখছে তাদের পরিবার। সবশেষে জগৎ বোসের মেয়েকে বাড়ির সকলের এবং সুকুমারের পছন্দ হয়। কৈলাস ডাক্তারও খুশি। ঠিক হয় কৈলাস ডাক্তার রাতে পাত্রীকে আশীর্বাদ করতে যাবেন। কিন্তু সেদিনই লাশ কাটা ঘরে আসে তিনটি লাশ যেগুলি পোস্টমর্টেম করতে হবে, যা কৈলাস ডাক্তারের পেশা। কাজটা খুবই জরুরি। সেদিন লাশকাটা ঘরে কৈলাস ডাক্তার মৃত তুলসীকে দেখে অবাক হন। তুলসির চামড়া কেটে দেখেন তুলসীর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য — ‘‘দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কূলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গা রাপ-ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত! বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন-প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, আছন্ন মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হাৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল। কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখলেন — থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পশুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা। কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন-খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।’’[৬]

তবে আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, তুলসীর জরায়ুর মধ্যে দেখা যায় একটি শিশুকে। আরো অবাক হন কৈলাস। এখানেও লেখকের বর্ণনা আশ্চর্যকর — ‘‘ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সূচিক্কন বাহুপটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন-পরিশঙ্কছ ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গানে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।’’[৭] নিতাইয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে লাশ কাটা ঘরের বাইরে সে সময় যদু ডোমের মন্তব্যটি গল্পের প্রধান লাইন — ‘শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে’। আসলে যে সুকুমার সুন্দরের জন্য এত মেয়ে খুঁজেছে প্রকাশ্যে, সে-ই গোপনে এক অসহায় কুৎসিত ভিখারি মেয়েকে গর্ভবতী করে দিয়েছে।

গল্পে সুকুমারকে প্রথমে এমন এক চরিত্র বলে মনে হয়, যে অত্যন্ত নিরীহ, যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে; কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, কাহিনির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ঘটনাগুলিকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই সবচেয়ে কার্যকর। শুরু থেকেই লেখক তাকে এক প্রকার নিভৃত ব্যঙ্গের ধারক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তার স্বভাবগত রূপান্তর — যা মূলত বাহ্যিক আচরণে সীমাবদ্ধ — তিনটি পৃথক পর্যায়ে ধরা পড়ে। প্রথম পর্যায়ে সে নিজেকে ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ বলে ভাবতে অভ্যস্ত; পরবর্তী পর্যায়ে সংসারজীবনে প্রবেশের চিন্তায় সে সুন্দরী স্ত্রী-নির্বাচনের প্রশ্নে দ্বিধা ও সংকটে পড়ে; আর শেষ পর্যায়ে তুলসীর সঙ্গে গোপন, স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগমুখী সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা তাকে এমন পথে ঠেলে দেয়, যার ফলে নিজের পরিকল্পনার ফাঁদেই তুলসীর জন্য মর্মান্তিক পরিণতির সৃষ্টি হয়। এই তিনটি স্তরেই সুকুমারকে লেখক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাহক করে তুলেছেন। সৌন্দর্য সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ধারণা তার অভিজ্ঞ পিতার দৃষ্টিভঙ্গির সামনে তুচ্ছ। পরিবার ও আত্মীয়মহলের মানুষজনও প্রাচীন সামাজিক মানদণ্ড অনুযায়ী তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে, এবং সেও সেই পথেই চলতে আগ্রহী। যখন কৈলাসবাবু গাঢ় বর্ণের মমতার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করতে চান, তখন সুকুমার স্পষ্টভাবে আপত্তি জানিয়ে বলে যে, এমন হলে সে যুদ্ধে যোগদান করবে। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ, বাহ্যিক সৌন্দর্য, জ্যোতিষ নির্ভর বিচার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস — এই উপাদানগুলিই তার কাছে সৌন্দর্য নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এই গল্পে সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এক বিশেষ জীবনবোধ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সুবোধ ঘোষ এখানে সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণের জন্য যে বাস্তবভিত্তি নির্বাচন করেছেন এবং তার ভেতরে যে জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা মূলত মধ্যবিত্ত মানসিকতারই প্রতিফলন। সুকুমারের চিন্তাধারা, তার পারিবারিক পরিবেশ, এমনকি তার পিতা কৈলাস ডাক্তার — সব মিলিয়ে এক মধ্যবিত্ত মানসিক

© Santiniketan Sahityapath

আবর্তের রূপ ফুটে ওঠে। কৈলাস ডাক্তার এই পরিসরে তুলনামূলকভাবে উদার ও সত্য-সন্ধানী হলেও, তাঁকেও এক জটিল পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বিস্মিত ও বিপর্যস্ত হতে হয়। এই আবহের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে জুড়ে যায় সর্বহারা তুলসী-ভিখারির জীবনকথা।

এই গল্পে লেখকের জীবনদর্শন প্রধানত নির্মল সৌন্দর্যের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে রয়েছে সুকুমারের সংকীর্ণ রূপবোধ, অন্যদিকে কৈলাস ডাক্তারের উদার ও মানবিক সৌন্দর্যচিন্তা — এই দুই বিপরীত মানসিকতার সংঘাতেই গল্পের মূল তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়। সুকুমারের সৌন্দর্যবোধ গড়ে উঠেছে সামাজিক কুসংস্কার ও ভোগবাদী চিন্তার ভিতের ওপর; তার মা ও পিসিমার দৃষ্টিতেও রূপের মূল্যায়ন নির্ভর করে পার্থিব হিসাব-নিকাশে। সুকুমার নিজেও নারীর সৌন্দর্যকে কেবল বাহ্যিক রূপেই সীমাবদ্ধ করে দেখে। বিপরীতে, কৈলাস ডাক্তার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন এক মুক্ত, নির্মল ও সর্বজনীন মানসিকতার আলোকে। এইভাবে গল্পে সৌন্দর্যের দুটি বিপরীত ধারণা সামনে আসে — একদিকে সমাজ ও পরিবারের কুসংস্কার-নির্ভর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে সকল বন্ধতা অতিক্রম করে থাকা বিশুদ্ধ ও মহান সৌন্দর্যচেতনা। কৈলাস ডাক্তারের দৃষ্টিতে কেউই প্রকৃত অর্থে অসুন্দর নয়; কিন্তু এই উচ্চমানসিকতা বাস্তবের কঠোর অভিঘাতে গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাঁর স্বপ্নময় ও আদর্শবাদী মন শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার নির্মমতায় ভেঙে পড়ে।

গল্পে সুকুমার এমন এক চরিত্র, যে নিজের সৌন্দর্যবোধের মাহাত্ম্য নিজেই নষ্ট করে ফেলেছে তুলসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল শারীরিক ভোগের স্তরে নেমে এনে। সেখানে সামাজিক নীতি, মানবিকতা বা নৈতিকতার কোনো স্থান থাকে নেই। বিকৃত মানসিকতা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের তাড়নায় সে নিজের কৃত্রিম আভিজাত্য বজায় রাখতে চায়। গল্পের অন্তিম পর্বে এই ভণ্ড অভিজাত চেতনার ওপরেই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করলেন লেখক। ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে সুকুমারের ভূমিকাই প্রধান। তুলসীর গর্ভে অবৈধ সন্তানের সৃষ্টি এবং নিজের কামনা পূরণের মধ্য দিয়ে সে এক গুরুতর পরিস্থিতির জন্ম দেয়। কিন্তু শেষ বিচারে তার এই কর্মকাণ্ডই তার আত্মপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্য-ধারণাকে ব্যর্থ করে দেয়। তার রূপ-অহং আসলে মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরে গড়ে ওঠা ভান ও অন্ধ সংস্কারেরই প্রতিফলন — গল্পকার এই সত্যটিকে তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

অভাবগ্রস্ত, নিরীহ ও সহজ-সরল তুলসীর প্রতি সুকুমারের আচরণ বিশেষভাবে নির্মম। তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটনাটি তার নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার চরম নিদর্শন। এখানেই ধরা পড়ে তার কথিত আভিজাত্যের অন্তর্নিহিত শূন্যতা ও অসততা। বাহ্যিকভাবে শিক্ষিত ও ভদ্র বলে পরিচিত এই যুবকের সৌন্দর্যচর্চা আসলে উপরিতলের চাকচিক্য মাত্র; তার অন্তরজগৎ গভীরভাবে কলুষিত। সুকুমার সেই ভেতরের পচনধারার প্রতিনিধিত্ব করে। গল্পকার এই চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের এক কঠোর সমালোচনা তুলে ধরেছেন। সুকুমার এবং কৈলাস ডাক্তার — উভয়েই সৌন্দর্যের অনুসন্ধানী হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুকুমার যেখানে বিদ্রূপের পাত্র, সেখানে কৈলাস ডাক্তার মানবিক ও সুস্থ জীবনদৃষ্টির বাহক। সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''সুবোধ ঘোষ তাঁর ''সুন্দরম্'' গল্পে সুন্দরের যে নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন, তাকে এই উত্তর আধুনিকযুগের দিশারী বলা যায়। 'simple absence of frame' বলতে যা বোঝায়, 'a structure of concealness' যা, সেই বিনির্মাণ সুন্দরের বিসর্জনে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অসামান্য হয়ে উঠেছে।''[৮]

তথ্যসূত্র:

১। 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', দ্বিতীয় খণ্ড, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩

২। 'কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০)', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ. ৩৬০

৩। 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ৪৪

৪। ওই, পৃ. ৪৪-৪৫

৫। ওই, পৃ. ৪২

৬। ওই, পৃ. ৪৯

© Santiniketan Sahityapath

৭। ওই, পৃ. ৫০

৮। ‘সুন্দরম্: সুন্দরের বিনির্মাণ’, তরুণ মুখোপাধ্যায়, আকর ‘গল্পচর্চা’, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, ১৫ অগস্ট ২০১৪, পৃ. ৭২৯

—

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath